Vol. 28 | No. 2 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গীতিকবি কায়কোবাদ : অশ্রুমালা প্রসঙ্গ

Volume	28
Issue	2
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফাতেমা কাওসার
Published online	February 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i2.6
Pages	140-166
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গীতিকবি কায়কোবাদ : অ

Check for updates

ফাতেমা কাওসার

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১–১৯৪১) মতো আর একজন কবির দীর্ঘায়ু লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, তিনি কবি 'কায়কোবাদ' (১৮৫৮–১৯৫২)।[১] তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল্ কোরেশী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ জীবনে তিনি সাহিত্য-চর্চায় ছিলেন নিরলস পরিশ্রমী। আবুল ফজল বলেছেন, "নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগ্ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে কায়কোবাদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর অদ্বিতীয়।"[২] সে যুগের অন্যান্য মুসলমান সাহিত্যিকরা যখন মুসলিম শৌর্যবীর্য প্রকাশের তাগিদে সাহিত্যচর্চা করছেন, তখন কায়কোবাদ সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন একজন গীতিকবির হৃদয়ের একান্ত অনুভূতির কথা নিয়ে, 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৭০) কাব্যের মাধ্যমে। সুদীর্ঘ জীবনে বহু কাব্য রচনা করলেও তাঁর দুটি প্রধান রচনা গীতিকবিতা 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫) এবং কাহিনীকাব্য "মহাশ্মশান' (১৯০৪)।

বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে কায়কোবাদের আবির্ভাব কালে বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দো-ভাষী পুথি সাহিত্যের দিকে। "দো-ভাষী পুথি' সাহিত্যের যুগে এই অশ্রুমালাই সেই সময়কার নতুন পরিবর্তিত সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের প্রবাহিত ধারার সঙ্গে মুসলমানদের যোগসূত্র স্থাপন করেছে।'[৩] আর এ কারণেই "আধুনিক বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে, বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে কায়কোবাদের আসন বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত।"[৪]

কায়কোবাদ তাঁর সক্রিয় কবি জীবনে উনিশ শতকের কবি মাইকেল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য-বলয়েই পরিভ্রমণ করেছেন। যুগের দাবীকে অস্বীকার করে, সচেতনতাকে পরিহার করে তিনি তাঁদের রচনারীতিকেই

অনুসরণ করেছেন। "... তার অন্যতম কারণ এই যে, সাহিত্যাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে সবসময়ে এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। আরেকটি কারণ, তাঁর শিক্ষাজীবনের সীমাবদ্ধতা—পরিবর্তনশীল জগৎ ও সাহিত্যকর্মের বিবর্তন উপলব্ধি করতে তাঁর শিক্ষা তাঁকে সাহায্য করেনি।"[৫]

কবির ব্যক্তিজীবনেও নিহিত আছে কোন কোন কারণ। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের বর্ণনা লক্ষণীয়: "তাঁর বয়স যখন মাত্র উনিশ বছর তখনই তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যু ঘটে। তখন থেকে নেমে আসে তাঁদের সংসারে নানা বিপর্যয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে স্বভাবতই পারিবারিক দায়িত্ব-ভার তাঁর উপরই বেশী করে এসে পড়ার কথা। ...আত্মীয় স্বজনের অবহেলায় এ সময় তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি প্রায় নষ্ট হয়ে যায় ফলে সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেই চলতে হয়েছে কবিকে। ডাক-বিভাগে স্বল্প-বেতনের এক চাকুরি করেই তাঁকে করতে হয়েছে জীবিকা অর্জন।...জন্মস্থান—এমনকি ঢাকা বিভাগের বাইরেও তিনি তেমন ঘোরাফেরা করেছেন তার কোন পরিচয় নেই। তখনকার বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল কলকাতা—সে কলকাতার সঙ্গেও তার তেমন যোগাযোগ ছিল না বলেই মনে হয়। ফলে তাঁর জীবনের পরিধি হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত ছোট ও গণ্ডীবদ্ধ আর তাও ছিল প্রায় গ্রাম্য।"[৬] কায়কোবাদের কাব্য বিচার করতে হলে তাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষা, প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, তা না হলে কবির প্রতি অবিচার করা হবে। কায়কোবাদের প্রতিভা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর প্রতিভা বিকাশের কিংবা তার উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। জন্মভূমি ও কর্মস্থল 'আগলা' গ্রামের সীমিত জগতে থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা ও মানসবিহার তেমন বিস্তৃতি লাভ করেনি। "তবে সুখে দুঃখে অভাব-অনটনের উত্থান-পতনে সব সময় তাঁর মন বিচরণ করেছে কাব্যের কুসুম কাননে।"[৭]

মাত্র ১২ বছর বয়সেই কবি রচনা করেন 'বিরহ-বিলাপ' কাব্য। অন্তরের এ তাগিদ একজন গীতিকবির। বস্তুতঃপক্ষে, কায়কোবাদের কবি প্রতিভা মূলতঃ একজন গীতিকবির। গীতিকবিতা নিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু, গীতি-কবিতার জগতেই আপন হৃদয়ানুভূতি প্রকাশে তিনি স্বাভাবিক ও সাবলীল। তাই পরবর্তীকালে কাহিনীকাব্য রচয়িতা হিসেবে খ্যাতিমান হলেও মনে

হয় তাঁর সফলতার মুখ্যক্ষেত্র ছিল গীতিকবিতা। "···গীতিকবিতা রচনায় তাঁর সার্থকতাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। অতি আধুনিক পাঠকের কাছেও কায়কোবাদের গীতিকবিতার আবেদন কম নয়।"[৮]

'বিরহ-বিলাপে'র পর, পনের বছর বয়সে, কবির পরবর্তী কাব্য 'কুসুম-কানন' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম দুটি কাব্যকে গীতিকবিতার রচনার ক্ষেত্রে কবির প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে। এ কাব্য দু'টিতে কবির প্রিয় দুই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)-এর কাব্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ। এ কাব্য দু'টির ভাষা 'অত্যন্ত সহজ', বক্তব্য 'আভরণহীন' এবং আবেগ 'দ্বিধাশূন্য'।[৯] বলাবাহুল্য, মুখ্য বিষয় প্রেম ও বিরহবেদনা।

'বিরহ-বিলাপ' ও 'কুসুম কাননে'র পরে কায়কোবাদের বিশিষ্ট গীতিকবিতার সংকলন হলো 'অশ্রুমালা' ও 'অমিয়ধারা' (১৯২৩)। এ কাব্য দু'টিই কবির সার্থক গীতিকবিতার সংকলন। 'প্রেমের ফুল' নামে আরও একটি গীতিকবিতার সংকলন পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় (১৯৪৬; প্রথম প্রকাশ ১৯৭০)।[১০] কিন্তু ভাব ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে 'প্রেমের ফুল' কাব্য 'অশ্রুমালা' ও 'অমিয়ধারা' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নয়। তাই 'গীতিকবি কায়কোবাদ'কে জানতে হলে, তাঁর গীতিকবিতার মূল্যায়ন করতে হলে, 'অশ্রুমালা' ও 'অমিয়ধারা' কাব্য দু'টির উপর নির্ভর করতে হয়। গীতিকবির অকৃত্রিম আবেগ কবির হৃদয়ে ছিল বলেই এ কাব্য দু'টিতে তাঁর সার্থকতা এসেছে সহজপথে। বর্তমান আলোচনায় আমরা 'অশ্রুমালা' অবলম্বনে গীতিকবি কায়কোবাদের পরিচয় সন্ধানে ব্রতী হবো।

২

'অশ্রুমালা' কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি কায়কোবাদ গীতিকবি হিসেবে পেয়েছিলেন স্বীকৃতি। এ কাব্যে কবি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 'অশ্রুমালা' কাব্যে কায়কোবাদ একজন সার্থক গীতিকবির মতোই তাঁর হৃদয়ের একান্ত অনুভূতিকে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে সহজ-সুন্দর-সাবলীল ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন, আবেগায়িত করে রূপ দিয়েছেন, ব্যক্তি-অনুভূতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন পাঠক-হৃদয়ে। ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন

ও জাতীয়-জীবনের বিচ্ছিন্ন ও টুক্‌রো টুক্‌রো অনুভূতিগুলো এক একটি অশ্রু বিন্দুর মতোই কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এ কাব্যে। অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও গীতিময়তা কাব্যটির প্রধান গুণ।

'অশ্রুমালা' কাব্যটি প্রকাশের পর পরই সাহিত্য সমাজের সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কবির নিজের ভাষায়, "... বহুদিন হইল আমি 'অশ্রুমালা' লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলাম। বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান সাহিত্যিকগণ উহা খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১১]

সে যুগের কয়েকটি অভিমত থেকে আমরা 'অশ্রুমালা' কাব্য সম্পর্কে কবির এ উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবো।

(ক) নবীনচন্দ্র সেন (১৮৯৬) : "মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না ; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। যেদিন মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গ ভাষায় অশ্রু বিসর্জন করিবে, সেদিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া কখনও উপস্থিত হয়, আপনার "অশ্রুমালা" তাহার প্রভাত শিশিরমালা স্বরূপ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।"[১২]

(খ) বঙ্গবাসী পত্রিকা (২১শে ভাদ্র, ১৩০৩) : "এ কবিতা পুস্তিকা-খানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না। সুকবি বাংলাদেশে বিরল, কায়কোবাদ সাহেব সুকবি-সুরসিক এবং ভাবুক। বোধ হয় তিনি এখনও যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাই অনুমান করি প্রেম বিষয়ে তাঁহার এত ঝোঁক এবং সেই অনুপাতে তাঁহার ভাষাও খুব জোরের ; কালে তিনি যশস্বী হইবেন ; আমাদের এমন ভরসা আছে।"[১৩]

(গ) ঢাকা গেজেটের সম্পাদক সে সময়ে লিখেছিলেন, "আমরা পুস্তিকা-খানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া এতদূর তৃপ্তি লাভ করিয়াছি যে শতমুখে

গ্রন্থকারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। কবি কায়কোবাদের অশ্রুজল অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রতি বিন্দুতেই শোকোচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান।···কবি কায়কোবাদ ভাষা গাঁথিতে জানেন—কাব্য সাজাইতে জানেন—ভাব আঁকিতে জানেন ও তাঁহার কবিতা কষ্ট কল্পনার জিনিস নহে—তোতা পাখীর নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিস—সহজ-স্বাভাবিক-প্রাণস্পর্শী।"[১৪]

কায়কোবাদ তাঁর গীতিকবিতায় জীবনের গভীর জটিলতায় বা সংসারের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মাঝে ডুব দিয়ে কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে যান নি বরং তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে, সুখ-দুঃখগুলোকে দরদ সহকারে প্রকাশ করেছেন। প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয় তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। নারীর প্রেম-সৌন্দর্য, বিরহ-যন্ত্রণা, আনন্দ-বেদনা, রোমান্টিক-চেতনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ব্যক্তিজীবনের একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা, লোকালয় বা সংসার ত্যাগ ক'রে বনবাসী হবার বাসনা সেইসাথে আধ্যাত্মিক-চেতনা, ঈশ্বরভক্তি, স্বজাতির অধঃপতনে বেদনাবোধ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর কবিতায় এসেছে। বিষয়-বৈচিত্র্যে কায়কোবাদের গীতিকবিতা তাই সমৃদ্ধ। "কায়কোবাদের মন বিচিত্রগামী ছিল—বহু বিষয় এসে তাঁর মনে দোলা দিয়েছে। তাঁর খণ্ড কবিতায় তাই বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব নেই।"[১৫]

'অশ্রুমালা' কাব্যেও কবির কাব্যভাবনা ও বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এ কাব্যের মূল সুর প্রেম। অতীত প্রেমের স্মৃতিচারণ, মিলন-আনন্দ, বিরহ-বেদনা, প্রিয়াকে না-পাওয়ার-যন্ত্রণা, অভিমান ও বিচ্ছেদের বিচিত্র অনুভূতি নিয়েই এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা রচিত। নারীর প্রেমের সাথে সাথে প্রকৃতিও এসেছে এ কাব্যে। কখনও প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন, কখনও বা প্রিয়ার রূপ ও অভিব্যক্তি প্রকৃতিতে খুঁজে পেয়েছেন, প্রিয়া ও প্রকৃতি তাই পাশাপাশি এসেছে অনেক কবিতায়। নারীর প্রেম ও প্রকৃতি-প্রেম বিষয়ক কবিতা ছাড়াও 'অশ্রুমালা' কাব্যে রয়েছে আরও নানাবিধ কবিতা। ঈশ্বরানুগত্য বা ধর্মানুভূতির কবিতা, মুসলমানদের জাতীয় জাগরণ-লক্ষ্যে রচিত কবিতা, নীতিমূলক কবিতা, দেশপ্রেম ও শোকগাথামূলক কবিতাও 'অশ্রুমালা' কাব্যে রয়েছে। বিষয়-বৈচিত্র্যে এ কাব্যটি তাই গীতিকবি কায়কোবাদের সার্থকতার পরিচয় বহন করে।

প্রতিটি বিষয়ই কায়কোবাদের কবি-প্রাণের আন্তরিকতায়, আবেগ-স্নাত হয়ে অন্তরঙ্গ রূপ পেয়েছে। কবির আত্মগত-ভাব-উচ্ছ্বাসময় গীতি-কবিতার সংকলন হিসেবে 'অশ্রুমালা' তাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। কবি নিজেই বলেছেন, "অশ্রুমালা যখন লিখি, তখন আমার হৃদয়টি নন্দন কাননের মত ফুলে ফলে মঞ্জরী মুকুলে সুশোভিত ছিল। মলয়-মারুতের স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে নানাবিধ কুসুমগুলি ফুটিয়া ফুটিয়া আমার হৃদয় কাননের নিভৃত নিকুঞ্জে এক সৌন্দর্য্যের উৎস ফুটাইয়া রাখিত।"[১৬]

কায়কোবাদ একজন প্রেমিক কবি। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রেম। 'কবিতার প্রধান উপাদানই প্রেম'—এ কবির নিজেরই উক্তি। 'অশ্রুমালা' কাব্যে প্রেমের কবিতাই প্রাধান্য পেয়েছে। এ প্রেম অপার্থিব বা অশরীরী নয়, কবির ব্যক্তি জীবনের যে প্রিয়া তাকে কেন্দ্র করেই এ প্রেম উৎসারিত হয়েছে। ব্যক্তি-হৃদয়ের অনুভূতি-স্নাত প্রেমের আবেগ ও উপলব্ধিই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি পর্যায় থেকে চিরন্তন ও চিরকালের প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়া-নুভূতিতে রূপ পেয়েছে, সার্বজনীন আবেদন স্থষ্টিতে হয়েছে সক্ষম। বস্তুতঃ কায়কোবাদের প্রেমের কবিতায় বাস্তবধর্মিতার পরিচয় রয়েছে, জীবন ও জগতকে ছেড়ে, মাটির পৃথিবীকে ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করেনি। কবির প্রিয়া এ মর্ত্যেরই মাটির মানুষ। 'অশ্রুমালা' কাব্যে আমরা কবির সেই মর্ত্য-লোকের প্রিয়ার পরিচয় পাই। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন : "অশ্রু-মালার প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদবহ। এ পর্যায়ে কবি-মানসী জনৈকা হিন্দু-বালিকা-গিরিবালা দেবী। 'ভুল' কবিতার প্রথম ছ'টি চরণের আদ্যাক্ষরে এ নামের স্বীকৃতি আছে। এবং 'একটি বালিকার প্রতি' ও 'ঊষাস্বপ্ন' কবিতায়ও উক্ত নামের উল্লেখ আছে। 'ঊষাস্বপ্ন' কবিতার শেষ দুটি চরণ :

> 'তুমি ছিলে ব্রাহ্মণ-কন্যা—আমি ছিনু মুসলমান
> কে জানিত দোহের মাঝে এতখানি ব্যবধান?'

ধর্মগত প্রভেদ এবং 'দেশাচার' কবির প্রেমের ব্যর্থতার কারণ—এ কথা 'প্রেমের স্মৃতি' ও 'শৈশব স্মৃতি' কবিতায়ও উচ্চারিত হয়েছে।"[১৭]

তরুণ বয়সের এই প্রেম, প্রেমে-ব্যর্থতা, বিরহ-যন্ত্রণা, জীবনে না-পাওয়া-প্রিয়ার কথাই 'অশ্রুমালা' কাব্যে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও বা পরোক্ষভাবে

এসেছে। গিরিবালার সঙ্গে হয়ত বা একতরফা প্রেম, প্রেমের শিহরণ ও আনন্দঘন অনুভূতি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা ও বেদনা থেকেই এ কাব্যের অধিকাংশ প্রেমের কবিতার সৃষ্টি। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ও উপলব্ধিজাত বলেই 'অশ্রুমালা' কাব্যের প্রেমের কবিতার আবেদন সার্বজনীন। গীতিকবি কায়কোবাদের এ এক পরম সার্থকতা। এ কাব্যের প্রেমের কবিতায় কবি বাঙালী প্রেমিক-কবির ঐতিহ্যের পথ ধরেই প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করেছেন, প্রিয়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, মিলনে হয়েছেন উৎফুল্ল, কখনও বা আক্ষেপ ও অভিমান করেছেন, বিরহ-ব্যথায় কাতর হয়ে করেছেন বিলাপ, প্রিয়াকে ছলনাময়ী বলেছেন, কখনও অতীত প্রেমের সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করে ব্যথিত হয়েছেন, অশ্রু বিসর্জন করেছেন। 'অশ্রুমালা' কাব্যে কবির প্রেম-ভাবনা তাই একান্ত মানবীয় আবেগে ভরপুর। প্রেমানুভূতির নিবিড় প্রগাঢ়তায় কবিতাগুলি উজ্জ্বল ও জীবন্ত।

নারীর রূপ ও সৌন্দর্য-বর্ণনা বাংলা কবিতায় একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। প্রায় সব কবিই প্রিয়ার রূপ বর্ণনাতে আগ্রহী। কায়কোবাদও তার ব্যতিক্রম নন। কবির প্রিয়াও 'রূপসী', সকল নারীর সেরা। 'অশ্রু-মালা'[১৮] কাব্যের 'পাগলিনী', 'প্রেমের স্মৃতি', 'কারে ভালবাসি', 'মানস-প্রতিমা', 'প্রেম-প্রতিমা', 'আমার প্রিয়া' প্রভৃতি কবিতায় কখনও সরাসরি কখনও প্রসঙ্গক্রমে কবি তাঁর প্রিয়ার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। কবি-প্রিয়ার রূপে মুগ্ধ-কবি জীবন্মৃত প্রায়—

সেই রূপ সেই হাসি,
আমি বড় ভালোবাসি
না হেরে তাহারে আমি জীবন্মৃত প্রায়
কোথা গেল আমার সে পাগলিনী হায়।
(পাগলিনী : অশ্রুমালা, পৃ. ৬৬)

কিংবা,

অথবা রমণী-মণি, প্রেমের অমৃত খনি,
রঞ্জিত সুবর্ণ-রাগে অই রূপরাশি!
নয়নে চপলা-হাস, বদনে মধুর ভাষ,
সৌন্দর্য্য সাগরে যেন ফুটন্ত রূপসী।

জ্যোৎস্না বিধৌত শোভা   গোলাপ রঞ্জিত আভা,
অধরে রক্তিম রেখা মুখে মৃদু হাসি!
স্বর্গীয় সৌরভ ভরা   জীবন্ত কুসুম-ছড়া,
পাগল করিল মোরে ঐ রূপ রাশি!
(কারে ভালবাসি : ঐ. পৃ. ১৩১)

কবি একাই যে তাঁর প্রিয়ার রূপে মুগ্ধ পাগলপ্রায় তা নয়। কবির বিশ্বাস :

হেরিলে সেই রূপরাশি, মুনি ঋষি হয় আপন হারা,
বহে তাদের প্রাণের মাঝে, মন্দাকিনীর সুধা-ধারা।
(উষা স্বপ্ন : ঐ. পৃ. ১৩৮)

কবি তাঁর এ রকম বিশ্বাসের কারণও বলেছেন। কবির মতে—

আমার প্রিয়া—সকল নারীর সেরা!
চাঁপার বরণ রংটি তাহার   ছড়িয়ে পড়ে রূপের বাহার
জগৎ ভরে নাই তুলনা
ফুল দিয়ে তা গড়া!
(আমার প্রিয়া : অশ্রুমালা, পৃ. ১৩৪)

এমনিভাবে বিভিন্ন কবিতায় কবি গীতিকবির সহজাত-প্রণতা-তাড়িত হয়েই প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করেছেন অন্তরের আবেগ দিয়ে। এ রূপ বর্ণনায় কোন বাহুল্য নেই, আতিশয্য নেই, বাস্তবতাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করার প্রবণতা নেই।

গিরিবালা দেবীর সঙ্গে প্রণয়ে ব্যর্থতা কবিকে করেছে বিরহ-যন্ত্রণা-কাতর। ব্যর্থ প্রেমের সে স্মৃতি ও জ্বালা নিয়েই কবি বেঁচে আছেন, প্রিয়াকে খুঁজে ফিরছেন সারাজীবন—

কোথায় আমার সেই ফুল কমলিনী?
যাহার প্রেমের স্মৃতি,
জাগে প্রাণে নিতি নিতি,
কোথায় আমার সেই কোহিনূর মণি?
(সোহাগিনী প্রিয়া : ঐ. পৃ. ১৩২)

অন্যত্র,

প্রাণের ভিতরে আমি
প্রতিমা গড়িয়া তার!
সারাটি জীবন ভ'রে পূজিয়াছি যত্ন ক'রে
সে কেন ছিঁড়িঁয়া দিল
হৃদয় আমার ?
(শৈশব স্বপ্ন : ঐ, পৃ. ১১০)

এ মানস-প্রতিমাকে, এ প্রিয়াকে, প্রিয়ার স্মৃতিকে নিয়েই কবি 'সে আজি কোথায়', 'প্রেম-প্রতিমা', 'প্রেমের স্মৃতি', 'মানস-প্রতিমা', 'ঊষাস্বপ্ন', 'একটি বালিকার প্রতি', 'কে তুমি,' 'ভুল', 'প্রেমের স্বপ্ন' ইত্যাদি কবিতাগুলো লিখেছেন। এ সমস্ত কবিতায় কবির প্রেমিক-হৃদয়ের আবেগ, অভিমান ও উচ্ছ্বাস, বিরহ-দগ্ধ প্রাণের ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে সুস্পষ্টরূপে।

প্রেমের মাদকতায় কবি বিহ্বল, ক্ষণিক পাওয়াতে তিনি তৃপ্ত নন, বরং আপন প্রিয়াকে একান্ত করে পাওয়ার প্রত্যাশায় কবি ব্যাকুল। সমাজের অনুশাসন, সংসারের বন্ধন ও দেশাচার কবির কাছে অসহনীয়। কারণ,

স্বার্থপর দেশাচার কেড়ে মোর কণ্ঠ-হার,
পরা'য়ে দিয়েছে হায়
অপরের গলে।
(প্রেমের স্মৃতি : অশ্রুমালা, পৃ. ১২২)

কবি তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে লোকালয় ছেড়ে বনবাসী হতে চান, নিভৃতে বসে দু'জনে কথা বলতে চান, যেখানে নেই কোন কোলাহল, বিধি-নিষেধ। 'সোনার খনি' 'সাম্রাজ্য মণি' এমন কি স্বর্গের সুখও কবির কাম্য নয়, যদি কবি তাঁর প্রিয়াকে কাছে পান, প্রিয়ার প্রণয়ের একটি মাত্র চুম্বন কবির কাছে অনেক মূল্যবান। কবি তাঁর প্রিয়াকে আহ্বান করছেন—

জরা নাই-মৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই
চল যাই সেই দেশে
এ'স সোহাগিনী।
(কে তুমি : অশ্রুমালা, পৃ. ১৫২)

প্রিয়ার সাড়া না পেয়ে, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়ার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধ'রে রেখে কবি আর্তনাদ করছেন, বিলাপ করছেন——

কোন্ দেশে কোথা গেলে পাইব তাহারে!
বারেক পাইলে ভুলে,
সাজাতেম ফুলে ফুলে,
আমার সে চিরারাধ্যা প্রেম প্রতিমারে!
(প্রেমের স্বপ্ন : ঐ, পৃ. ১৫৮)

প্রিয়াকে খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত কবি বিভিন্ন কবিতায় প্রিয়াকে মিনতি করেছেন, আহবান জানিয়েছেন। 'ভুলিলে কেমনে', 'জীবনময়ী', 'কে তুমি', 'প্রিয়তমার প্রতি', 'হৃদয়-রাণী' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর হৃদয়ের যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে ব্যর্থ কবির মনে সন্দেহ, সংশয় ও ভয় দেখা দিয়েছে। প্রিয়ার প্রতি ক্রমশঃ কবি সন্দিহান হয়ে উঠেছেন, নানা আশংকায় আন্দোলিত হচ্ছে কবির হৃদয়;

আমার পাগল মন,
সদা ঘোর উচাটন
বুঝালে বোঝেনা সে যে বুঝিতেও চাহেনা!
সে বুঝি আমারে ভাল বাসেনা!
(হতাশের আক্ষেপ : অশ্রুমালা, পৃ. ১৪৩)

সংশয়-সন্দেহের দোলায় কবি-চিত্ত বিক্ষুব্ধ, তিনি তাঁর প্রিয়াকে 'পাষাণময়ী', 'ছলনাময়ী' ইত্যাদি বলে অভিযুক্ত করেছেন। কবির জিজ্ঞাসা——

তার কি হৃদয় নাই, দয়া নাই-মায়া নাই,
কেন তবে সে আমারে দেয় এত যাতনা!
(ঐ, পৃ. ১৪৪)

অন্যত্র,

কঠিন হৃদয় তব
ভালবাসা জান না!
চরণে দলিয়া যাও
ফিরেও তো দেখ না।
(রমণী কুসুম : অশ্রুমালা, পৃ. ১৮৮)

প্রিয়াকে অভিযুক্ত করার পর আক্ষেপের সুরে কবি বলছেন—

আগে ত জানিনে আমি, দেবী বেশে সে পাষাণী
হানিবে এ ছোরা মোর
প্রাণের ভিতরে!
(শৈশবের স্বপ্ন : অশ্রুমালা, পৃ. ১২১)

প্রিয়ার প্রতি সন্দেহে, অভিমানে, হতাশায় কবি সমগ্র নারী-জাতির প্রতিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে—

জগতে কি সুখ নাই? প্রেম নাই-প্রীতি নাই,
নারীর হৃদয় ভরা কেবলি কি ছলনা?
(হতাশের আক্ষেপ : অশ্রুমালা, পৃ. ১৪৪)

প্রিয়ার প্রতি সংশয়-সন্দেহ-অভিমান নিয়ে শেষ পর্যন্ত কবি প্রিয়ার উদ্দেশে বলছেন :

আসিও তখন, অভাগা যখন
মুদিবে নয়ন দু'টি,
আকুল বাসনা বা'লে মুরছিয়া
চরণে পড়িবে লু'টি
আসিও তখন ছুটি!
(কবির সমাধি : অশ্রুমালা, পৃ. ১৬৫)

প্রণয়ে ব্যর্থ কবি নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছেন এই বলে—

ভালবাসা পা'ব ব'লে
ভাল ত বাসিনে তারে!
চাইনে হৃদয় তার
আমি ভালবাসি যারে!
(ভালবাসা : অশ্রুমালা, পৃ. ১৯৩)

শুধু তাই নয়, কবি আরও বলছেন,

মিলনে কি সুখ বল
　　সে ত পুতিগন্ধ ভরা
বিরহে পরম সুখ
　　পুলকে মাতায় ধরা !
(ঐ)

মান-অভিমান, অভিযোগ, সংশয়-সন্দেহের শেষে অস্থির ও ক্লান্ত প্রেমিক-কবি শেষ পর্যন্ত একটি বিশ্বাসে ফিরে আসেন, সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রিয়াকে বলছেন :

প্রাণের মিলন্ আমাদের সই, হ'য়ে গেছে বহুদিন,
তুমি আমার-আমি তোমার, কেহই ত নহে ভিন্ !
এ জগতে দৈহিক মিলন, হ'লনা প্রাণ তোমার সনে
পর জনমে হবে মিলন, গোলাপ ফুলের কুঞ্জবনে !
(ঊষাস্বপ্ন : অশ্রুমালা. পৃ. ১৪১)

এখানে কবি অনেক শান্ত, স্থির। কবির প্রিয়ার প্রতি তাঁর আর কোন অভিমান বা অভিযোগ নেই। পর জনমে মিলনের প্রত্যাশা ও বিশ্বাস নিয়েই কবি তাঁর বিরহ-দগ্ধ-হৃদয়কে শান্ত করেছেন। প্রেমের কবিতায় কায়কোবাদের প্রেমিক-সত্তা মানবীয়-অনুভূতিতে বিহ্বল। কবির প্রেম শুধু কবিকেই নয় পাঠকদেরও আন্দোলিত করে। মানবীয়-প্রেমের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ রয়েছে তাঁর কবিতায়। সৈয়দ আলী আহসান যথার্থই বলেছেন, " 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থে কবির প্রণয়বেদনার স্বাক্ষর আছে, বিভিন্ন কবিতায় প্রণয়ক্ষেত্রের বঞ্চনা এবং প্রণয়-লাঞ্ছিত জীবনের প্রগাঢ় বেদনার পরিচয় আছে।" [১৭] কায়কোবাদের প্রেম-ভাবনার সঙ্গে কবি নজরুলের প্রেম-ভাবনার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কায়কোবাদের প্রেমও অশ্রুজলের, বিরহ ও হতাশার। নজরুল যেমন তাঁর প্রিয়াকে কখনও দেবী, কখনও পাষাণী বা ছলনাময়ী বলেছেন কায়কোবাদকেও আমরা দেখি প্রিয়াকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে চিহ্নিত করতে। শুধু পরবর্তী কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গেই নয় পূর্ববর্তী কবি বিহারীলাল এমন কি বৈষ্ণব কবিদের কবিতার সঙ্গেও কায়কোবাদের

প্রেমের কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে। কায়কোবাদ 'বিরহিণী রাধা'কে নিয়েও কবিতা লিখেছেন। কায়কোবাদের সব প্রেমের কবিতাই যে গিরিবালা দেবীকে নিয়ে রচিত তা নয়, কিছু কবিতা পত্নী তাহেরউন্নিসাকে নিয়েও লেখা। কবি তাঁর প্রেমের বিচিত্র অনুভূতির আন্তরিক ও গীতিময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন অশ্রুমালা কাব্যে। আর এখানেই গীতিকবি কায়কোবাদের সাফল্য। কাজী দীন মুহম্মদ তাই বলেছেন, "অশ্রুমালা প্রেম-বিরহ-বেদনামূলক একখানি সার্থক গীতিকাব্য।"২০

৩

নারীর প্রেমের মতো প্রকৃতি প্রেমও কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' কাব্যের একটি প্রধান বিষয়। পল্লীর স্নিগ্ধ প্রকৃতির কোলেই কবির জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে। প্রকৃতিকে কাছে থেকে দেখার, তার সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ হয়েছিল কবির। সেইসাথে যুক্ত হয়েছিল কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি। এ কারণেই প্রকৃতি-চেতনা তাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট। প্রকৃতি, প্রকৃতির সৌন্দর্য কখনও তাঁর কাব্যে সরাসরি এসেছে, কখনও প্রিয়ার সৌন্দর্য প্রকাশের বাহন হয়ে এসেছে। পাখীর গান, নদীর কলতান, জ্যোৎস্না রাত, ফুলের সৌরভ ইত্যাদি সবকিছুই কবির হৃদয়কে মুগ্ধ ও আলোড়িত করেছে।

প্রকৃতি কায়কোবাদের কবিতায় এসেছে সহজ, স্বাভাবিকভাবে। প্রিয়ার রূপ ও প্রেমানুভূতিকে চিত্রিত করার জন্য তিনি প্রায় সময়ই প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। 'প্রেমসঙ্গীত', 'প্রেমের স্মৃতি', 'বউ কথা কও', 'মানভঞ্জনের একটি চুম্বন', 'বন-ফুল', প্রভৃতি কবিতায় কখনও কবি মুগ্ধ-মনে প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন, কখনও প্রিয়ার সৌন্দর্য ও সান্নিধ্য প্রকৃতিতে খুঁজে পেয়েছেন। যেমন :

সমীরে তাহারি শ্বাস, গোলাপে তাহারি বাস,
দেহের বরণ তার
চম্পকের ফুলে!

নক্ষত্রে তাহারি হাসি, চাঁদে তার রূপরাশি
তারি মুখ দেখি আমি
ফুলে ও মুকুলে।
(প্রেমের স্মৃতি : অশ্রুমালা, পৃ. ১২২)

'বউ কথা কও' পাখীর ডাকে কবি ব্যথা উপলব্ধি করেন এবং অতীতের স্মৃতিকে মনে করেন—

এমন মধুর, স্বরে কে গায় ও স্বজনি,
প্রকৃতির প্রাণে সুধা ঢালিয়া!
কি ব্যথা উহার প্রাণে জাগে দিবা রজনী,
থেকে থেকে কেন উঠে কাঁদিয়া।

উহার যে কণ্ঠ সুরে এ হৃদয় মোহিয়া
কি জানি কাহার স্বর ভাসিছে!
অতীতের ছায়াগুলি উঠিছে ভাসিয়া
শৈশবের কথা মনে পড়িছে!
(বউ কথা কও : অশ্রুমালা, পৃ. ১৯০)

প্রকৃতি যে শুধুমাত্র কবির সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে তীব্র করেছে তা নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝেই, নির্জনতার মাঝেই কবি তাঁর প্রিয়াকে পেতে চান, প্রকৃতি থেকে উপাদান নিয়েই কবি তাঁর প্রিয়াকে সাজাতে চান, প্রিয়ার মান ভাঙ্গাতে চান—

মান ক'রনা প্রাণ প্রেয়সি,—মান ক'রনা প্রাণ্ আমার
আজকে তোমায় পরিয়ে দিব জুঁই চামেলী ফুলের হার!
এ'স এ'স প্রাণ প্রেয়সি, এ'স আমার হৃদয় মাঝে,
প্রাণ ভরিয়ে দেখ্‌বো তোমায়, সাজিয়ে আজ ফুলের সাজে।
(মানভঞ্জনের একটি চুম্বন : অশ্রুমালা, পৃ. ১২৮)

কবি তাঁর প্রিয়াকে বলছেন,

নদীর ধারে বনের মাঝে লতায় ঘেরা কুঞ্জবনে,
থাক্‌ব দোহে নিরিবিলি করতে প্রেমের আলাপন।
(ঐ, পৃ. ১২৯)

'বন-ফুল', 'বাসি-ফুল', 'বেল-ফুল', 'ফুল ও কলি', 'জন্মভূমি', 'আগলা গ্রাম' প্রভৃতি কবিতায়ও কবি কায়কোবাদের প্রকৃতি-চেতনার পরিচয় রয়েছে। প্রকৃতির মনোরম রূপ ও রীতি এসব কবিতায় সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রেম ও প্রকৃতির কবি কায়কোবাদ আপন অন্তরে গীতিকবির নিঃসঙ্গ-বেদনাবোধ, সংসারের যন্ত্রণা, ভাব-তন্ময়তা প্রভৃতি অনুভূতিতে তাড়িত হ'তেন। ব্যক্তি-জীবনেও কবি 'নিভৃতে-নির্জনে বসিয়া নিজের কার্য্য' করতে ভাল বাসতেন। গীতিকবির এ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর 'অশ্রুমালা' কাব্যেও রয়েছে। কবি এ সংসারের কোথাও শান্তি খুঁজে পান না—

প্রাণের অশান্তি নিয়ে,
যাই আমি যথা তথা!
কেউ ত বুঝে না মোর,
প্রাণের গভীর ব্যথা!
(অচেনা পথিক : অশ্রুমালা, পৃ. ৬৫)

সংসারের প্রতি কবির কোন মোহ নেই, প্রিয়াকে দেখেই তিনি সুখী, প্রিয়ার হাসির বিনিময়ে সবকিছু তাকে দিয়ে তিনি সংসার ছেড়ে বনে যেতে চান। সংসার-সংগ্রামে-ক্লান্ত কবির ইচ্ছে—

তারি রূপ ধ্যান ক'রে
ইচ্ছা হয় থাকি পড়ে
ভুলে যাই সংসারে যন্ত্রণা-ভীষণ।
(ভালবাসি তারে : ঐ, পৃ. ১৮০)

কবি তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে যন্ত্রণাময় সংসার ছেড়ে বনবাসী হতে চান, প্রিয়ার সান্নিধ্যই কবির কাম্য, সংসারের কোলাহল তাঁর পছন্দ নয়—

ইচ্ছা হয় তারে নিয়ে
বনবাসী হই
চাইনে এ লোকালয়, এ যে বড় বিষময়,
নিরালায় বসিয়া দোহে
কত কথা কই!
(সে আমারে ভালবাসে : ঐ, পৃ. ১৮৫)

বনের নির্জনতাই কবির কাম্য। 'আপনার ভাবে আপনি বিহ্বল' কবি আর কিছুই চান না—

চাহিনে ঐশ্বর্য্য-ভাতি, চাহিনে যশের খ্যাতি
আমি যে আমারি ভাবে
মুগ্ধ আছি দিবানিশি।
(নিবেদন : ঐ, পৃ. ৫১)

এ মুগ্ধতা, এ অনুভূতি ও উপলব্ধি একজন রোমান্টিক গীতিকবির অন্তরের নিবিড়তায় পূর্ণ। সংসারের মাঝে অবস্থান করেও এঁদের অধিকাংশই নির্জনতা-নিঃসঙ্গতা-বিলাসী। এক রোমান্টিক-চেতনায় এঁরা সব সময়ই থাকেন আচ্ছন্ন-ভাব-বিভোর।

৪

প্রেমিক-কবি কায়কোবাদ শুধুমাত্র নারীর প্রেমেই বিভোর ও বিহ্বল নন, স্রষ্টা বা ঈশ্বরের প্রেমেও তিনি অবনত। 'অশ্রুমালা' কাব্যে আমরা তাঁর বেশ কতকগুলি আধ্যাত্মিক প্রেম চেতনামূলক কবিতা পাই, যেখানে কবির ধর্মানুভূতি ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে গভীরভাবে। 'প্রার্থনা', 'আমি কে', 'ভুল ভেঙ্গে দাও', 'প্রেমময়ীর কুঞ্জবন', 'ঐশ চিন্তা', 'সাকী', 'শবে কদর', 'অর্চনা', 'কেন ডাকে পাখী' প্রভৃতি কবিতায় আমরা তাঁর ধর্মীয়-চেতনা ও ঈশ্বরভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। ভক্ত কবির একান্ত নির্ভরতা, বিশ্বাস ও ভাব-তন্ময়তা গীতিময় রূপ লাভ করেছে এসব কবিতায়। 'আমি কে' কবিতায়, কবি স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—

কে তুমি? কে আমি বিভো? দেও সত্যজ্ঞান।
আমি কি তোমারে ছাড়া?
তুমি কি ব্রহ্মাণ্ড ভরা?
কোথা তবে তুমি আমি?—কত ব্যবধান?
(আমি কে : অশ্রুমালা, পৃ. ৮)

আপন অন্তরে জিজ্ঞাসার উদয় হলেও কবি বিভ্রান্ত হননি, বরং স্রষ্টার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন, নির্ভর করেছেন এবং ব্যাকুলভাবে মিনতি করেছেন—

তব দয়া বিনে নাথ এ ঘোর আঁধারে,
কে দিবে দেখায়ে পথ,
কে পুরাবে মনোরথ
পড়েছি বিষম ঘোর সমস্যার ফেরে!
(ঐ, পৃ. ৯)

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক চেতনা কবির হৃদয়ে এত গভীরতর যে, নারীর প্রেমে-বিহ্বল, বিরহ-যন্ত্রণায়কাতর প্রেমিক-কবি তখন তাঁর সেই প্রেমকেও তুচ্ছ মনে করেছেন। স্রষ্টার প্রতি প্রেম বা অধ্যাত্ম-প্রেমকেই বড় করে দেখেছেন :

এ ক্ষুদ্র জীবন ল'য়ে কেন এত আশা,
জান না কি এ জগৎ নিশার স্বপন।
মায়া মরীচিকা প্রায় স্নেহ-ভালবাসা ;
জীবনের পাছে অই রয়েছে মরণ।
(সায়াহ্ন : অশ্রুমালা, পৃ. ৩১)

এ কারণেই কবির উপলব্ধিজাত সত্য,

এ সংসার মরুময়,
কেউ যে কাহারো নয়,
ভাই বন্ধু মাতা-পিতা
স'বি যে রে ফাঁকি।
(কেন ডাকে পাখী : ঐ, পৃ. ১০০)

এ সত্যকে আবিষ্কার করার ফলশ্রুতিতে কবি গত জীবনের কথা স্মরণ করছেন এবং অনুশোচনায় দগ্ধ কবি আক্ষেপ করছেন—

রমণীর প্রেম-মন্ত্রে ভুলিয়া সকল,
ভাই-ভগ্নী পরিজনে এসেছি ত্যজিয়া!

জীবনের সার ব্রত দিয়াছি ছাড়িয়া,
চলেছি পুতুল প্রায় নাহি আত্মবল!
(মানব-জন্ম : অশ্রুমালা, পৃ. ২৭)

একদিকে নারীর প্রেমে মুগ্ধ কবি প্রিয়ার জন্যে সংসারের সবকিছু ত্যাগ করতে আগ্রহী, এমন কি স্বর্গের সুখকেও প্রত্যাখ্যান করতে প্রয়াসী, তিনিই আবার অধ্যাত্ম-প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর প্রেমকে তুচ্ছ জ্ঞান করছেন। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেছেন, "কায়কোবাদের কবিতায় আমরা প্রায়ই এই দ্বৈত-ভাব লক্ষ্য করি : একদিকে জীবনের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবনকে অস্বীকার করবার প্রচেষ্টা।"[২১] তবে উভয় ক্ষেত্রেই কবির আন্তরিকতা সীমাহীন, উপলব্ধি গভীর-তর, এখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই। 'নারীর প্রেম' কবির হৃদয়ে যেমন সত্য 'অধ্যাত্ম প্রেম'ও তেমনি সত্য। এ দু'টি মানুষের জীবনেরই অঙ্গীভূত, কোনটিকেই অস্বীকার করা যায় না।

কায়কোবাদের ধর্মানুভূতি সম্পর্কে আবুল ফজল বলেছেন, "তাঁর এ ধর্মানু-ভূতি গভীর আত্মোপলব্ধিরই ফল—তাই তাঁর উপাস্য কোন ধর্ম গ্রন্থে সীমিত হয়ে নেই। তাঁর অন্তরেই তার অধিষ্ঠান। সব ক্ষেত্রে এ আন্তরিকতাই এ কবির বৈশিষ্ট্য।"[২২] আধ্যাত্মিক-চেতনা-জাত উপলব্ধি থেকে কায়কোবাদ বুঝেছিলেন—এ জীবন ক্ষণিকের, এখানে সব মানুষ সমান। মানুষ কর্তৃক মানুষের অপমান, নির্যাতন ও শোষণ তাঁর হৃদয়কে করেছে তাই বিচলিত। মানুষের জীবনের নানাবিধ অসঙ্গতি তাঁকে পীড়িত করেছে, মানবাত্মার ব্যথায় হৃদয় হয়েছে তাঁর ব্যাকুল। 'রাজা ও ভিখারিণী', 'ত্রিধারা', 'সংসার', 'মানব-জন্ম', 'অন্ধ ভিখারিণী', 'কর্মফল' ইত্যাদি কবিতায় কবি মানব জাতির পরিণতি ও ব্যথা-বেদনার সঙ্গে আপন হৃদয়ানুভূতিকে এক করে দেখেছেন এবং মানুষকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করতে চেষ্টা করেছেন। 'ত্রিধারা' কবিতায় কবি মানুষের জীবনকে ভ্রান্ত পথিকের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন—'সংযোগ খেয়া'তে চড়ে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে—

এই খেয়া ভিন্ন আর নাহিক উপায়,
রাজা কিংবা মহারাজা,

অথবা দরিদ্র প্রজা
সকলেরি এই পথে যেতে হবে হায়!
(ত্রিধারা : অশ্রুমালা, পৃ. ১২)

প্রত্যেক মানুষের পরিণতি যখন এক ও অভিন্ন, তখন পৃথিবীতে স্বল্প সময়ের জন্যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে একে অপরকে অপমান করে কি লাভ! 'রাজা ও ভিখারিণী' কবিতায় কবি তাই বলছেন—একই ঈশ্বর 'রাজা ও ভিখারিণী' ধনী-দরিদ্র সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্রষ্টার সৃষ্ট প্রকৃতি জগত থেকেই মানুষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে বেঁচে থাকে। তবুও মানুষ মানুষকে নৃশংসভাবে পীড়ন করছে, অথচ আজ যে ফকির দু'দিন পরে সেই আমীর হতে পারে। কবি তাই মানুষকে সাবধান ও সচেতন হতে বলছেন—

আপনি মানব হ'য়ে অপর মানবে
নৃশংসের প্রায় কেন দলিছ চরণে!
ধনের গৌরব তব কত দিন রবে?
চিরকাল বেঁচে তুমি রবে কি ভুবনে?

শুধু তাই নয়,

উভয়ের মৃত দেহ রাখিলে শ্মশানে
কে চিনিবে তুমি রাজা, সে যে ভিখারিণী?
রাজার কি চিহ্ন বল থাকিবে সেখানে
কে চিনিবে সে দরিদ্রা, তুমি মহাধনী?
(রাজা ও ভিখারিণী : অশ্রুমালা, পৃ. ১৪)

কায়কোবাদ শুধুমাত্র মানুষকে সাবধান হতেই বলেন নি, সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদও করেছেন। 'অন্ধ ভিখারিণী' কবিতায় কবি নির্যাতিত ভিখারিণীর প্রতিনিবিম্ব করেছেন। সমাজে ক্ষমতাধারী পাষাণ-হৃদয় একজন কনস্টেবল রাজপথ থেকে অন্ধ এক ভিখারিণীকে তুলে দিলে তিনি ভিখারিণীর কণ্ঠে স্রষ্টার উদ্দেশে যে ভাষা দিয়েছেন তাতে তাঁর নিজেরই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—

এত অত্যাচার সহে না ত আর
কোথা তুমি ভগবান!

চোখে কি দেখ না কানে কি শোন না
নাহি কি তোমার প্রাণ ?
(অন্ধ ভিখারিণী : অশ্রুমালা, পৃ. ৩০)

ব্যক্তি জীবনের দুঃখ-বেদনা কবিকে যেমন বিষাদগ্রস্ত করেছে সমাজের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাও কবিকে করেছে বিচলিত। কবি মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন মানুষকে কষ্ট না দিতে, অত্যাচার ও পীড়ন না করতে—

কারু প্রতি অত্যাচার ক'রনা কখন
মন ও মসজিদ ভাঙ্গা উভয় সমান।
(কর্মফল : অশ্রুমালা, পৃ. ১০৯)

মানুষকে তিনি লোভ-হিংসা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি পরিহার করে চলতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতিই কায়কোবাদের মনে জীবন ও জগতের স্থায়িত্বহীনতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এ অনুভূতি দ্বারা চালিত হয়েই কায়কোবাদ সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজন হতে পেরেছিলেন, সমাজের নির্যাতিত ও উপেক্ষিত মানুষের ব্যথা তাঁর হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর গীতিকবিতায় ব্যক্তি-হৃদয় ও ব্যক্তি-জীবনের হাহাকার ছাড়াও সমাজের সাধারণ মানুষের হাহাকারও তাই ধ্বনিত হয়েছে গীতিকবির আবেগময় সুরে। এদিক দিয়ে কবি মানবতার কবিও বটে।

৫

'অশ্রুমালা' কাব্যে কবির কাব্য-ভাবনার প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখবো যে, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝেই তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। কাব্যের বিষয় হয়েছে কবির নানাবিধ চেতনা ও উপলব্ধি। ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ, ব্যর্থ-প্রণয়ের না-পাওয়ার জ্বালা, সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের নিপীড়িত জীবনের যন্ত্রণা—এ সব যেমন কবিসত্তায় কাব্য প্রেরণার উৎস হয়ে এসেছে তেমনি জাতীয় জীবনের অধঃপতনও তাঁকে সমভাবে পীড়িত করেছে। জাতীয় গৌরবমূলক বেশ কিছু কবিতা পাই আমরা 'অশ্রুমালা' কাব্যে। এ সব কবিতায় কবি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মুসলমানদের অতীত

গৌরবের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। মুসলমানদের জাতীয় গৌরবের বিলুপ্তি, তাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা কবিকে ব্যথিত করেছে। কবি তাই তাদের অতীত গৌরবের স্মৃতিচারণ করে তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। 'সীরাজ সমাধি', 'মোশ্লেম-শ্মশান,' 'দিল্লী', 'তাজমহল', 'ঈদ-আবাহন', 'আবাহন' এ সমস্ত কবিতায় কবির অতীত স্মৃতি-রোমন্থন-জাত বেদনা ও আর্তনাদের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

'মোশ্লেম-শ্মশান' কবিতায় কবি এককালের ঐতিহ্যবাহী 'দিল্লী'র কথা স্মরণ ক'রে ব্যথাতুর হয়ে পড়েছেন। কবি আক্ষেপ করছেন—

হা অদৃষ্ট, কি দেখিনু এ পাপ নয়নে,
যমুনা-সৈকতে অই ভীষণ শ্মশান!
ইশ্লাম গৌরব-রবি ডুবেছে যেখানে
কাঁদায়ে জন্মের মত মোশ্লেমের প্রাণ!
(মোশ্লেম-শ্মশান : অশ্রুমালা, পৃ. ৯৩)

'দিল্লী', 'তাজমহল' কবিতা দুটিতেও কবির অন্তর অতীত স্মৃতিচারণে যন্ত্রণা-কাতর। 'দিল্লী' কবিতায় কবি বলছেন :

হায় দিল্লী কেন তুমি এ মলিন বেশে
কেঁদে কেঁদে মৃতপ্রায় র'য়েছ পড়িয়া!
... ...
ছিলে তুমি ভারতের চারু রাজধানী,
কে ছিল তোমার সম? ঝলসি নয়ন
শোভিত তোমার শিরে, কোহিনূর মণি,
স্তম্ভিত তোমার বীর্য্যে সমগ্র ভুবন!

কিন্তু,

বক্ষে তব আজ,
সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল!
(দিল্লী : অশ্রুমালা, পৃ. ৬০)

'আবাহন' কবিতাটি কাবুল নৃপতি এনাতুল্লাহ্‌র ভারত আগমন উপলক্ষে রচিত। মুসলমানদের দৈন্যের কথা বলে কবি তাকে বলছেন—

কি দিয়া করিব তোমার সম্মান,
আমরা ভিখারী মোশ্লেম সন্তান
ভিক্ষা ঝুলি আজি মোদের করে!
... ...
ভারতের আর কি দেখিবে তুমি,
ভারত এখন ঘোর মরুভূমি.
হৃদয়ে তাহার অনলের খনি
নাই আর সেই সৌন্দর্যরাশি।
... ...
মোশ্লেমের দুঃখে শোকাকুল সবে
চারিদিকে আজি বিষাদ-স্মৃতি।
(আবাহন : অশ্রুমালা, পৃ. ৮৬)

কায়কোবাদ মুসলমানদের অতীত গৌরবের কাহিনী, তাদের প্রবল প্রতাপ, ঐতিহ্য ও শৌর্যবীর্যের প্রাণময় রূপ দিতে চেয়েছেন। সে যুগের প্রায় সব মুসলিম কবিই জাতীয় জাগরণের জন্যে, জাতিকে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্যে, বার বার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের দিকে ফিরে চেয়েছেন। কায়কোবাদও একই প্রয়াসে জাতীয় জাগরণ-মূলক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি সেইসাথে মুসলমানদের আহ্বান করে বলছেন :

সবাই জেগেছে বিশ্বে কেহই ত নাহি আর ঘুমে,
শুধু কি একাই তুমি রহিবে পড়িয়া এই ভূমে ?
আলস্য জড়তা ত্যজি বিভু নাম স্মরি নিজ মনে,
এস হে মোশ্লেম এস আজি এই মহা শুভক্ষণে!
(ঈদ আবাহন : অশ্রুমালা, পৃ. ৫৪)

'অশ্রুমালা' কাব্যে কায়কোবাদের স্বদেশপ্রেম-চেতনারও পরিচয় আছে। 'জন্মভূমি', 'আগলা গ্রাম', 'ভিক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় কবির মাতৃভূমি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মভূমিকে কবি 'জননী'র মর্যাদা দিয়েছেন—

তখন ছিলাম শিশু ভাবি নাই মনে
বিদেশে দৈবের বশে করিব গমন।
এইভাবে কষ্টে কষ্টে পর প্রপীড়নে
জন্মভূমি জননীর যাইবে জীবন।
(জন্মভূমি : অশ্রুমালা, পৃ. ৪১)

'আগলা গ্রাম' কবিতায় কবি আন্তরিকতার সাথে নিজের জন্মভূমির বর্ণনা দিয়েছেন, শৈশবের স্মৃতিচারণ করেছেন এবং ফেলে আসা দিনগুলোর জন্যে আক্ষেপ করেছেন :

আজো মনে পড়ে সেই
প্রিয় জন্মভূমি !
কতদিনে তার বুকে
ঘুমাইব আমি।
(আগলা গ্রাম : অশ্রুমালা, পৃ. ৭৩)

'ভিক্ষা' কবিতায় কবি নিপীড়িত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে ভারত-মাতার প্রতিনিধিত্ব করছেন। রাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

চাহিনে মা ধনরত্ন চাহিনে কাঞ্চন,
আমার সন্তানগণ খেতে যেন পায় !
স্নেহ-দৃষ্টি সমভাবে রেখ অনুক্ষণ
অনাথিনী কন্যা তোর এই ভিক্ষা চায়।
(ভিক্ষা : অশ্রুমালা, পৃ. ৭৫)

কায়কোবাদের কবি-প্রাণ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতিও ছিল গভীর দরদ ও ভালোবাসায় পূর্ণ, তাঁর পরিচয় এসব কবিতায় সুস্পষ্ট। এখানেও কবির আন্তরিকতা আবেগময় রূপ পেয়েছে।

৬

'অশ্রুমালা' কাব্যে বৈচিত্র্যধর্মী কবিতার মধ্যে আমরা শোকগাঁথামূলক ক'টি কবিতাও পাই, যেখানে প্রিয়জন কিংবা প্রিয়ব্যক্তির বিয়োগ-ব্যথায় কবির হৃদয় আর্তনাদ করে উঠেছে। 'সিরাজসমাধি', 'পিসীমা আমার', 'ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর' এসব কবিতায় কবি শোকে আকুল হয়ে তাঁর হৃদয়ের আর্তিকে প্রকাশ করেছেন। 'পিসীমা আমার' কবিতায় পিসীমা'র বিয়োগ ব্যথা কবির কাছে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে——

পিসীমা আমার !
কোথায় গেলি গো তুই ত্যজিয়া আমারে !
হায়রে এ হৃদি তলে
ভীষণ অনল জ্বেলে
ডুবাইয়ে এ পরাণ ঘোর হাহাকারে।
(পিসীমা আমার : অশ্রুমালা,পৃ. ৪৭)

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতায় কায়কোবাদ ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুতে চারদিকে যে শোকের উচ্ছ্বাস তার বর্ণনা দিয়েছেন। 'শোক সঙ্গীত'–এ এক সন্তান-সম ছেলের অকালমৃত্যুতে এক নারীর আর্তনাদ রূপায়িত করেছেন সুন্দরভাবে।

এ ছাড়াও আমরা 'অশ্রুমালা' কাব্যে আরও কিছু কবিতা পাই যে-গুলিকে, কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। 'কবি ও সমালোচক', 'স্মৃতিলিপি', 'এক-বর্ষ' প্রভৃতি কবিতা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ কায়কোবাদ তাঁর কবি-মানসকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই কোন একটি মাত্র বিষয়ে তাঁর আবেগ স্থির থাকেনি। বহু বিচিত্র বিষয় তাঁর কাব্যের বাহন হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবেই। 'অশ্রুমালা' কাব্যেও আমরা কায়কোবাদের হৃদয়াবেগের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ দেখি। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে, কবির হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস, আনন্দ-বেদনা উৎসারিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি কবিতাই হয়ে উঠেছে আন্তরিকতাপূর্ণ ও গীতোচ্ছ্বাসময়। ''কায়কোবাদ-কাব্যের বিশেষ করে তাঁর খণ্ড কবিতার এক বড় বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতা— তাঁর অন্তরের সুগভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অধিকাংশ গীতিকবিতায়। এ ক্ষেত্রে তাঁর কবি-সত্তার সততায় কোন রকম ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। কবি-সত্তায় তিনি খাঁটি ও অকৃত্রিম।''[২৩] কায়কোবাদের কাব্য সম্পর্কে এ উক্তি যথার্থ। 'অশ্রুমালা' কাব্যটিও এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে।

হৃদয়ের একান্ত বিচ্ছিন্ন ও টুক্‌রো অনুভূতিগুলো গীতময় সুরে প্রকাশেই কায়কোবাদের কবি-প্রতিভা বেশী সার্থকতা লাভ করেছে। এ কারণেই

তিনি মহাকাব্য ও কাহিনীকাব্য রচনার সংযত মনের পরিচয় দিতে পারেন নি। বরং মহাকাব্যের সংযম ও গাম্ভীর্যকে উপেক্ষা করে গীতিময়তা সেখানেও প্রকাশ পেয়েছে। 'মহাশ্মশানে'র অন্তর্নিহিত ভাব গীতিকাব্যের করুন রস-আশ্রিত, এ কাব্যের প্রেরণা খাঁটি গীতি-প্রেরণা। 'কবি-প্রাণের দুর্বার আবেগে 'মহাশ্মশান' হয়েছে গীতিমুখর। সমসাময়িক কালে গীতিকবিতার কুলপ্লাবী তরঙ্গ এবং বাঙালী কবির উচ্ছ্বাস-প্রবণ মন ঐতিহাসিক মহাসংগ্রামের সমগ্র কোলাহলকে স্তব্ধ করে বেদনার করুণ সঙ্গীতে ধ্বনিত করে তুলেছে। 'মহাশ্মশান' কাব্যের গানগুলো কবির ব্যক্তিচিত্তের বেদনাকেই ব্যক্ত করেছে।'[২৪] আবুল ফজলও বলেছেন, ''গীতি কবিতার লক্ষণ 'মহাশ্মশানে' প্রচুর। মনে হয় কায়কোবাদ আসলে ও মূলতঃ গীতি-কবিই—মহাকাব্য রচনায় হাত দিয়েছেন তিনি জাতীয়-কর্তব্য সাধনের তাগিদেই।''[২৫] গীতিপ্রবণতা কায়কোবাদের কবি-প্রাণের সহজাত ধর্ম। তাই এ ক্ষেত্রেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। 'অশ্রুমালা' কাব্যটি কায়কোবাদের গীতিকবিতা-সংকলনের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

৭

'অশ্রুমালা' কাব্যের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা 'অমিয়ধারা' ও 'প্রেমের ফুল' নামে আরও দুটি গীতিকবিতার সংকলনের পরিচয় পাই। ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কাব্য দুটিতে আমরা 'অশ্রুমালা' কাব্যেরই অনুবর্তন দেখি। নারীর প্রেম, অধ্যাত্ম প্রেম, স্বদেশ প্রেম, প্রকৃতি প্রেম ও জাতীয় গৌরবমূলক কবিতাই 'অমিয়ধারা' কাব্যে পাওয়া যায়। তবে 'অশ্রুমালা' অপেক্ষা এ কাব্যে কবির আন্তরিকতা, অনুভবের গভীরতা ও স্পষ্টতা একটু বেশী। 'অশ্রুমালা'তে আবেগের যে প্রকাশ ঘটেছে 'অমিয়ধারা'তে এসে তা পূর্ণতা পেয়েছে।

'প্রেমের ফুল' কাব্যটি কবির পরিণত বয়সের রচনা। আধ্যাত্মিক প্রেম ও পার্থিব প্রেমই এ কাব্যের মূল বিষয়। পূর্ববর্তী কাব্য দুটিতে পার্থিব প্রেমে যে বৈচিত্র্য এবং আধ্যাত্মিক প্রেমের যে বিকাশ তা 'প্রেমের ফুল' কাব্যে সংহত রূপ পেয়েছে। তথাপি উনিশ শতকের আদর্শানুসারে আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সহজ-সরল-অনাড়ম্বর প্রকাশরীতিতে রচিত 'অশ্রুমালা'ই কায়কোবাদের সার্থক গীতিকাব্য।

তথ্যনির্দেশ

১ 'মহাশ্মশান', ষষ্ঠ সংস্করণ : জুন, ১৯৭৪, মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'নূতন সংস্করণের ভূমিকা' অবলম্বনে কায়কোবাদের জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল উল্লেখিত হল।

২ আবুল ফজল সম্পাদিত 'কাব্য-সংকলন : কায়কোবাদ', প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ—১৩৭৪, 'কায়কোবাদ : কাব্য পরিচিতি', পৃ. ২ (উদ্ধৃত)

৩ এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম : 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য', দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬৯, পৃ. ৫৫

৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', বাংলা একাডেমী, প্র. প্র. ১৬ ই জুন, ১৯৭০, পৃ. ৩১০

৫ আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' তৃতীয় প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৯০ ; সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ২২৪

৬ আবুল ফজল সম্পাদিত 'কাব্য-সংকলন : কায়কোবাদ', পৃ. ৫, ৮

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৮ মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান ও দেওয়ান শামসুল হক সম্পাদিত 'মহাকবি কায়কোবাদ', প্র. প্র. ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৯০, রফিকুল ইসলাম, 'কায়কোবাদ', পৃ. ৯১

৯ সৈয়দ আলী আহসান, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', পঞ্চম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৮৫, পৃ. ২৭৪

১০ মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান : 'কবি কায়কোবাদের কাব্য-ভাবনা', পৃ. ১০

১১ 'মহাশ্মশান' ; ষষ্ঠ সংস্করণ : জুন ১৯৭৪, কবির 'ভূমিকা' পৃ. ।।/০ থেকে উদ্ধৃত।

১২ সৈয়দ আলী আহসান : মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

১৩ 'প্রেমের রাণী', প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৭৬, গ্রন্থকারের ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৪ (উদ্ধৃত)

১৪ 'অশ্রুমালা' ষষ্ঠ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৬, পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৮০, কাব্যের শেষে 'তদানীন্তন কালের কয়েকটি অভিমত' থেকে উদ্ধৃত।

১৫ আবুল ফজল সম্পাদিত 'কাব্য-সংকলন : কায়কোবাদ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৬ 'মহাশ্মশান', ষষ্ঠ সংস্করণ, জুন ১৯৭৪, কবির 'ভূমিকা' অংশ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ।।/০

১৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', পৃ. ৩৬৪, ৩৬৫

১৮ 'অশ্রুমালা', ষষ্ঠ সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৬, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৮০, এই সংস্করণ থেকেই বর্তমান নিবন্ধে প্রয়োজনীয় কবিতার উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে।

১৯ সৈয়দ আলী আহসান : "কায়কোবাদ সম্পর্কে", মোহাম্মদ বদরুল আলম খান ও দেওয়ান শামসুল হক সম্পাদিত 'মহাকবি কায়কোবাদ', পৃ. ৭২

২০ কাজী দীন মুহম্মদ : "কায়কোবাদ", 'সাহিত্য সম্ভার', প্র. প্র. জানুয়ারী ১৯৬৫, পৃ. ৬৯

২১ আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২২৭

২২ আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২৪ কাজী আবদুল মান্নান : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৬ (১৯৬৯), পৃ. ৪৩৯

২৫ আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩